খুঁতওয়ালা ভেবে বিয়ে ভেঙে দেয়। এসব কারণে এবার আপার বিয়ের আগে ভাগেই আমাকে দূরের এক ফুফুর বাসায় রেখে আসা হলো, যেমন কোনো উটকো ঝামেলা না বাধে। আপার বিয়ের অল্প কিছুদিনের মাথায় বড় ভাইয়া চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গেল। যাওয়ার আগে ভাইয়া আমার সাথে ফুপুর বাসায় দেখা করতে এলো। আমাকে বুকে টেনে নিয়ে ভাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদলো, 'তোর মত একটা শান্ত লক্ষী বোন আছে আমার, এটা আমার জন্য যে কত বড় পাওয়া তুই জানিস না। কখনো মন খারাপ করবি না। তাত্তু ওর এসএসসি পরীক্ষাটার পরই এসে তোকে বাসায় নিয়ে যাবে। কখনো মাথা নিচু করে চলবি না। তুই যা দেখিস, আমরা তা দেখতে পাই না। তুই যা শুনিস, আমরা তা শুনতে পাই না। জীবনে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখবি সব সময়। দেখবি একদিন সেই আলোতেই চারদিক আলোকিত হবে।'

আমি প্রায় প্রতিদিন আমার ফুপাতো বোন রুনুকে দিয়ে বাসায় তাত্তুর পরীক্ষার খোঁজ-খবর জানতে চিঠি লিখতাম। জানি না সেই চিঠি আদৌ বাসায় পৌঁছাতো কি না! আমি একদিন দুদিন করে অপেক্ষা করতাম, কবে তাত্তুর পরীক্ষা শেষ হবে আর কবে আমি বাসায় যাবো... আমার মা-বাবার কাছে যাবো। কিন্তু বাসায় আমার আর কখনোই যাওয়া হলো না।

আমি যে ফুফুর বাসায় থাকতাম তিনি আমায় বড্ড ভালোবাসতেন। তিনি আমার নামের পাশে সবসময় একটা 'সোনা' বসাতেন। প্রথম প্রথম তার ভালোবাসা আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হতো, কেননা বড়দের ভালোবাসার সাথে আমি সেভাবে কখনোই অভ্যস্ত ছিলাম না। একদিন 'মশা গুনগুন' সন্ধ্যায় যখন আপার কথা খুব মনে হচ্ছিল, তখন আস্তে করে গাইছিলাম আপার সেই 'আলোর' গানটা আর চোখের সামনে সৃষ্টি করলাম কতগুলো রঙের একটা অবয়ব যেটাকে আমি সেই ছোটবেলা থেকে 'আপা' হিসেবে কল্পনা করে আসছি। আমার গাল বেয়ে পানি ঝরতে লাগলো। জানি না কেন, নিজের জীবনটার প্রতি একটা অসহ্য বিতৃষ্ণা তৈরি হলো। দয়া করে কেউ যদি আমায় একটু ভালোবাসে তবেই যেন আমি সুন্দর জীবন পাব। আমার নিজের পথ চলার কোনো উপায় নেই। আমার অসহায়ত্বই যেন আমার একমাত্র অবলম্বন। আমার কণ্ঠে 'আলোর' গানটা কখন যে কান্নায় পরিণত হলো, টেরই পাইনি। ফুফু পেছন থেকে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওকি সোনা? কান্না কেন তিমা সোনা? তোমার তো ভারি মিষ্টি গলা। দাঁড়াও, কালই একটা ব্যবস্থা করছি।' পরদিন ফুপু আমার জন্য যে ব্যবস্থাটা করলেন তাতে আমার পুরো জীবনটাই অন্যরকম হয়ে গেল। তিনি আমাকে এক সঙ্গীত স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। শুরু হলো আমার সঙ্গীত জগতে নতুন জীবন।

আমি যখন কণ্ঠে সুর তুলতাম, তখন চোখের সামনে তৈরি করতাম অনেক রঙের ছবি। একেকটা গানের জন্য একেকটা ছবি। আর ছবিগুলো গানের সুরে সুরে চেহারা বদলাতো। অন্ধ বলেই হোক, বা কণ্ঠের জন্যেই হোক, অল্প দিনেই আমার খুব নাম হয়ে গেল। ব্যস্ততাও বেড়ে গেল অনেক। আজ অমুক জায়গায় রেকর্ডিং, তো কাল প্লেব্যাক। অনেক দিন পর যেদিন আপার সাথে দেখা হলো, সেদিন আপা আমায় জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না, 'আমি যা করতে পারিনি তুই তা পেরেছিস। আমি জানতাম তুই পারবি।' আপা বার বার এই কথাগুলোই বলছিল। ভাইয়া আমাকে সুদূর বিলেত থেকে একটা বিলেতি গিটার পাঠিয়েছে, যেটা আমি বাজাতে না পারলেও স্পর্শ করে ভাইয়ার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। তাত্তু এখন মস্তবড় অফিসার। সে থাকে খুলনায়। আর কলিমণির খুব শিগগির বিয়ে। কিন্তু মজার কথাটা হলো, এবার আমার বাবা-মা কলিমনির বিয়েতে আমাকে অবশ্যই থাকতে বলেছে। বলেছে আমি না গেলে নাকি বিয়ের পুরো অনুষ্ঠানই পন্ড! আমার বাবা-মা এখন গর্ব করে বলে যে তারা তিমা রহমানের বাবা-মা!

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে অনেক আগেই। তারপরও সাংবাদিকরা যেন তিমা রহমানের পিছু ছাড়ছেই না। 'কিছু মনে করবেন না আপা, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি। আপনার মতো দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অথচ এতো জনপ্রিয় একজন শিল্পীকে অনেকেই কর্নিয়া সংযোজনের মাধ্যমে চোখের আলো ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। আপনি ব্যাপারটি কিভাবে...'

'... দেখছি, তাইতো জানতে চাচ্ছেন? আমি তো ভাই দেখতেই পাই না। দেখতে চাইও না। হতে পারে পৃথিবীটা অনেক আলোকিত, অনেক সুন্দর। কিন্তু আমার আলো হচ্ছে আমার ছোট ছোট আশাগুলো। যেগুলোর আমি রঙিন অবয়ব দিই। আশাই আমার অন্ধকার ভুবনটাকে আলোকিত করেছে। আমি অন্য কোনো আলোর ভুবনে যেতে চাই না। চাই না।'

দ্বিতীয় জীবন

তৃতীয়

তৈয়বুর রহমান

মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর বেঁচে থাকাটা আমার জন্য অনেক সহজ হয়ে গেল। জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় কাটিয়ে দেয়ার পর আমার মনে প্রথমবারের মতো প্রশ্ন জাগলো কেন বেঁচে আছি। অনেক ভেবে জবাব পেলাম, আসলে বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই, কোনো অর্থ নেই। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি মরে গেলেও কিছুই আসতো-যেতো না। আজ থেকে ত্রিশ বছর পর মরলেও কিছু আসবে-যাবে না। বেঁচে থাকাটা খুব একটা খারাপ কিছু নয় আবার খুব একটা ভালো কিছুও নয়। শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকাটা তাই অর্থহীন। তবে মরে যাওয়াটা কেমন সেটা এখনও জানি না, তাই সেটা জানতেই বড় ইচ্ছা করছে। সম্ভবত সেটা বেঁচে থাকার মতো এতোটা একঘেয়ে জিনিস হবে না। তাই সব দিক ভেবেচিন্তে মরে যাওয়াটাকেই আমার কাছে বুদ্ধিমানের কাজ মনে হলো।

এতোসব দার্শনিক কথার আসলে কোনো মানে নেই। আমার মরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নেই। খুব সহজ সরল কারণ। আমার মা দুদিন আগে মারা গেছেন। কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই সুস্থ মানুষটি দুম করে মরে গেলো। তার দু সপ্তাহ আগে আমার অনেক কষ্টে জোগাড় করা প্রাইভেট ফার্মের চাকরিটি চলে গেছে। এটাও কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই দুম করে চলে গেল। আর আজকে আমার প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে না, বলা যায় হয়ে গেছে। এতোক্ষণে বোধহয় কবুল-টবুল বলা শেষ, গেস্টরা সবাই ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ি যাচ্ছে। আমারও দাওয়াত ছিলো। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর একদিন পরই নিজের প্রেমিকার বিয়ের দাওয়াত খাওয়াটা ঠিক হবে কিনা সেটা বুঝতে পারছিলাম না বলে আর যাওয়া হলো না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটাও একদম দুম করে হয়ে গেলো। আমার প্রেমিকাটি একদিন চোখ মুছতে মুছতে আমাকে বললো...ধুর, কি জানি কি বললো ঠিক মনে নেই। তবে খুব কেঁদেছিলো, এটা মনে আছে।

সবগুলো ঘটনা কেমন যেন সিনেমার মতো পরপর ঘটে গেলো। ওই যে অনেক সিনেমাতে যেমন শুরুর দশ-পনেরো মিনিটে নায়কের ছোটবেলার ঘটনাগুলো পরপর দ্রুত ঘটে যায়। ভিলেনের গুলি খেয়ে নায়কের বাবা-মা সবাই মারা যায়। নায়কের ভাই-টাই থাকলে একজন থেকে আরেকজন আলাদা হয়ে যায়, তারপর দৌড়াতে দৌড়াতে নায়ক বড় হয়ে যায়। এবং তারপর পুরো ছবিতে নায়ক শুধু নায়িকার সঙ্গে গান গায় আর একের পর এক ভিলেনকে কুপোকাত করতে থাকে। আমার ঘটনাগুলোও এমন দ্রুত ঘটে গেলো। কিন্তু আমার গল্পের ভিলেনটি যে কে, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হতে পারে আমার নিয়তি। আমার পুরো বাসা এখন খালি। মা ছাড়া পৃথিবীতে আমার তেমন কেউ ছিলো না। মা মারা যাওয়ার পর যে দু'একজন সান্ত্বনা দিতে এসেছিল তারাও দায়িত্ব পালন করে চলে গেছে। আমি ভূতের মতো নিজের খালি বাসায় কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। গতকালই বিভিন্ন দোকান ঘুরে ঘুরে অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ জোগাড় করেছি। জোগাড় করতে বেশ ঝামেলা হয়েছে। দোকানিরা ঘুমের ওষুধ চাইলেই কেমন যেন সরু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। আমি কি করতে যাচ্ছি তা কি সবাই বুঝে ফেললো নাকি? এখন সত্যি আমি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছি। আমার কষ্ট পাওয়ার আর কোনো কারণ নেই। নিশ্চিন্ত মনে তাই একটা ঘুম দিলাম। শেষ ঘুম ঘুমানোর আগের একটি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত ঘুম।

খুব সকালে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। রাতে জানালার পর্দা ঠিকমতো টেনে দেয়া হয়নি। পর্দার ফাঁক গলে এক চিলতে আলো এসে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। ভোরের প্রথম আলো এসে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। আমার জন্য হয়তো এটাই শেষ আলো। এটাই যখন শেষ আলো, তখন একে আর আসতে বাধা দিয়ে লাভ কি? আমি উঠে গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দিলাম। এবার আর এক চিলতে নয়, একরাশ আলো এসে আমাকে মিষ্টি পরশ বুলিয়ে দিল। ভোরের আলো তো, তাই মোটেও ঝগড়াটে নয়, ভীষণ আদুরে। আমার হঠাৎ করেই ইচ্ছে হলো আরো একটি দিন অন্তত বেঁচে থাকতে। একটা দিন বেশি বাঁচলে নতুন কিছুই হবে না জানি, তারপরও হঠাৎ কেন যেন এই অর্থহীন ইচ্ছেটা হলো।

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS

ত্রিশ বছর পরের কথা। আমি এখনও বেঁচে আছি। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে একটি দিনে আমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হলো না। মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আমি আরও একটি দিন বেশি বাঁচতে চেয়েছিলাম। সেই দিনটি আমাকে নতুন কিছু দেয়নি। সেদিন আমার জীবনে চমকপ্রদ কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু কেন জানি না, সেই দিনটি কাটিয়ে দেওয়ার পর পরদিন ভোরবেলা উঠে আমার মনে হলো আরও একটি দিন বেঁচে থেকে দেখি। এভাবেই চলে গেল অনেকদিন। এক সময় আমি বুঝতে পারলাম বেঁচে থাকা যায়। মাকে হারিয়ে, চাকরি হারিয়ে অথবা প্রেমিকাকে হারিয়েও বেঁচে থাকা যায়। সেই বেঁচে থাকাটা যে শুধু বেঁচে থাকার জন্য তাও নয়। এখন আমি সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছি, তবে নিজের ইচ্ছায় নয়। আমার লিভার নষ্ট হয়ে গেছে। আমার বড় দুই ছেলে আমাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবকিছুই করেছে। নানা দেশ ঘুরে এসে এখন আমি নিজ দেশের এক হাসপাতালে শুয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছি। এখন আমার এক হাত ধরে বসে থাকে আমার স্ত্রী আর অন্য হাত আমার ষোড়শী কন্যা। আমার মেয়েকে আমি আদর করে ডাকি পরী। অবিকল পরীর মতোই আমার মেয়েটি। বিশ্বাস হতে চায় না, এটি যে আমারই মেয়ে। মনে হয় হঠাৎ করেই একদিন আকাশ থেকে নেমে এসেছে আমার এই মিষ্টি মেয়েটি।

কয়েক দিন আগে আমার পাশের বেডে নতুন রোগী এসেছে। ছেলেটির বয়স বিশ-একুশ হবে, নাম আকাশ। আকাশ অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো। ছেলেটি সারাদিন বিষণ্ন হয়ে থাকে। আমি হালকা কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করলাম।

: কয়টা খেয়েছিলে?

: ৩২টা।

: মাই গড, ৩২টা স্লিপিং পিল দিব্যি হজম করে ফেললে? আজকাল ঘুমের ওষুধেও দেখছি ভেজাল।

আকাশ কিছু বলল না। এই ছেলেটিকে আমি একবারও হাসতে দেখলাম না। কয়েক দিন ধরে চেষ্টা করার পর আকাশ আমার সঙ্গে কিছুটা সহজ হলো। আকাশ নীলা নামের একটি মেয়েকে ভালোবাসতো। আকাশ আর নীলা মিলে হয় আকাশনীলা। কিন্তু আকাশের নীল রঙ তাকে ছেড়ে একদিন চলে গেল। বর্ণহীন আকাশ তাই অভিমানে সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলো। আকার কাছে সারাদিন একের পর এক লোক আসছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আকাশের কাছে কেউ আসে না। আকাশের কেউ নেই। একবার শুধু এক দূরসম্পর্কের মামা এসে কিছুক্ষণ বিরক্তমুখে বসে থেকে চলে গেছে।

দুপুরবেলা লোকজনের ভিড় একটু কমলে আমি আমার পরীকে কাছে ডাকলাম। ফিসফিস করে পরীকে বললাম,

: এই! সকাল থেকে তুই আমার পাশের বেডের ছেলেটির দিকে এমন আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছিস কেন?

: ধ্যাৎ, কি যে বলো না বাবা।

: ছেলেটি দেখতে বেশ। তবে একটু গাধা আছে।

: কেন? গাধা হতে যাবে কেন?

: গাধা না হলে কেউ আত্মহত্যা করতে যায়? তবে ছেলেটির হজমশক্তি চমৎকার। ৩২টি স্লিপিং পিল দিব্যি হজম করে বসে আছে।

: আবার ফাজলামো! দিনকে দিন তুমি যতো বুড়ো হচ্ছো, তোমার রসবোধ বাড়ছে।

: এই পরী, একটা কাজ করতে পারবি?

: কি কাজ বাবা?

: আকাশের হাত ধরে ওর চোখে চোখ রেখে একশবার বলবি... ভালোবাসি ভালোবাসি।

: যাও বাবা, সব সময় ফাজলামি ভাল্লাগে না।

মেয়ে আমার লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। আমার কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলো। আমি আরও শক্ত করে আমার পরীকে জড়িয়ে ধরলাম। পরীকে আমি আর কিছু বললাম না। আমি জানি কি করতে হবে, সেটা আমার পরী খুব ভালো করেই বুঝে গেছে।

বিকেলবেলা পরী গেলো আকাশের কাছে। ছেলেটি এভাবে পরীকে আসতে দেখে নিশ্চয়ই বেশ অবাক হয়েছিলো। পরী বেশ রাগ রাগ সুরে বললো,

: এই যে মশাই, কি ভেবেছেন আপনি? দুনিয়ার সব দুঃখ-কষ্ট আপনি একা নিয়ে বসে থাকবেন। দিন তো আমাকে, আপনার যা যা কষ্ট আছে ঠিক দুই ভাগ করে অর্ধেকটা আমাকে দিন। জলদি দিন, মাপে কমবেশি হলে চলবে না। ঠিক অর্ধেকটুকু আমাকে দিতে হবে।

আকাশ হেসে ফেললো। আমি এবার জানালার বাইরের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেও হাসছে।

: হাসবেন না বলছি, খবরদার! আপনার হাসি খুব বিচ্ছিরি।

আকাশ আবার হাসলো।

: আপনার নাম আকাশ কে রেখেছে বলুন তো। আপনার সঙ্গে তো আকাশের কোনোই মিল নেই। আসুন তো আমার সঙ্গে, বাইরে আসুন, দেখি মিলিয়ে আপনার সঙ্গে আকাশের কোনো মিল খুঁজে পাই কিনা।

আমি আড়চোখে দেখলাম পরী আকাশের হাত ধরেছে।

আমি মরে যাবো যেকোনো দিন। হয়তো আগামীকাল, অথবা আজই। কিন্তু আমার এখন প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ইচ্ছে হয় আরও একটি দিন বেশি বেঁচে থাকতে, আরও একটি ভোরের আলো দেখতে। আমরা আমাদের সারা জীবনে শুধু একের পর এক জিনিস চেয়েই যাই। কখনও চাই মায়ের কাছে, কখনও প্রেমিকার কাছে আবার কখনও বন্ধুর কাছে। সবচেয়ে বেশি চাই সৃষ্টিকর্তার কাছে। সেই চাওয়া কখনও-বা পূর্ণ হয়, বেশির ভাগ সময়ই হয় না। সৌভাগ্যবান মানুষেরা হয়তো অনেক কিছুই পেয়ে যায়। এই সহজ সত্যটা সবাই জানে কিন্তু বুঝতে পারে না সবসময়। সারাটা জীবন চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলাতে মেলাতেই সময় চলে যায় সবার। কিন্তু প্রায় সব মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় হয়তো আসে, যখন সে আর হিসাব মেলাতে পারে না। না পাওয়ার অভিমানে তখন সে সব ফেলে চলে যেতে চায়। কেউ কেউ হয়তো চলেও যায়, আবার কেউবা পায় দ্বিতীয় জীবন। সেই দ্বিতীয় জীবন হয়তো প্রথম জীবনের মতোই হাসি-কান্নায় মেশানো, কিন্তু তখন সে জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যটি ধরে ফেলে - জীবনে নতুন করে পাওয়ার কিছুই নেই, জীবনটাই তো মস্ত এক পাওয়া।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নামছে। জানালার পর্দার ফাঁক গলে শেষ বিকেলের এক চিলতে আলো এসে আমাকে আদর করে গেল। পরী এখনও আকাশের হাত ধরে আছে। আমি জানি কাল ভোরের প্রথম আলোটি এসে মিষ্টি পরশ বুলিয়ে আকাশের ঘুম ভাঙাবে।

আনন্দ স্কুল

চতুর্থ

নাসের রহমান

মুনা অনেকের মুখে শুনেছে শহরের ভালো স্কুলে ভর্তির ব্যাপারটা বেশ ঝামেলার। বাচ্চাদের হলে তো আর কথা নেই। মাকেও আবার নতুন করে লেখাপড়া শুরু করতে হয়। কথাগুলো শুনেছে সে, কিন্তু বাস্তবে বাচ্চা ভর্তি যে আরো অনেক কঠিন তা তখন বুঝতে পারেনি। মীমের জন্মের আগে মনে করতো সন্তান জন্ম দেয়া খুব কঠিন কাজ, পরে সে ধারণা পাল্টে গেল, যখন দেখলো লালন-পালন আরো কঠিন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার চেয়ে আরো শক্ত সন্তানের স্কুল ভর্তি। চার বছরের একটা শিশুকে এভাবে খাতা পেনসিল নিয়ে লিখিত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তা ভাবতেও অবাক লাগে। গত কয়েক মাস থেকে বাচ্চাটিকে বাংলা, ইংরেজি বর্ণমালা লেখার অভ্যাস শুরু করিয়েছে। বাংলা, ইংরেজি সব বর্ণমালা আর সংখ্যাগুলো একনাগাড়ে মুখস্থ বলে যেতে পারে। কিছু বর্ণমালা চিনতে ও লিখতেও পারে। আধো আধো কথা বলার সময় থেকে মুনা তাকে বাংলা ছড়া কবিতা শেখাতে শুরু করেছে। সেসবও অনর্গল বলে যেতে পারে। ইদানীং বারের নাম, মাসের নাম, ফুল ফল পাখির নামও মুখস্থ করিয়েছে। কিন্তু এখন সব ভালো স্কুলে বাচ্চাদের লিখিত পরীক্ষা হবে শুনে তার মাথা স্থির রাখতে পারে না। ভর্তি পরীক্ষার এ্যাডমিট কার্ড আনতে গিয়ে সে হেড মিসট্রেসের সাথে দেখা করে। এতো ছোট বাচ্চাদের কিভাবে লিখিত পরীক্ষা নেবেন? যাদের এখনও বর্ণমালা চেনার বয়স হয়নি তারা প্রশ্ন কিভাবে পড়বে? হেড মিসট্রেস তার কথা শুনে বললেন, দেখুন আমার এখানে নার্সারিতে দুই শিফটে সিট আছে নব্বইটা। ভর্তির জন্য আবেদন পড়েছে এ হাজারের ওপর। বলুন আমি কাকে বাদ দিয়ে কাকে নেব। মুনা মিসট্রেসের মুখের ওপর বললেন, তাই বলে কি শিশুর ওপর এভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করবেন? আপনি যদি একে মানসিক চাপ মনে করেন, তাহলে অন্য স্কুলে ভর্তি করান। অনেক

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS